HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা
বর্ষ ৬ • সংখ্যা ৩ • সেপ্টেম্বর ২০০৮
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

বাংলাদেশে *পটকা* মাছ খেয়ে টেট্রোডোটক্সিন বিষের প্রাদুর্ভাব

পৃষ্ঠা ১১

বাংলাদেশে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর খামার-কর্মীদের ওপর নজরদারি

পৃষ্ঠা ১৬

সার্ভিলেন্স আপডেট

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় মানুষের হাত ধোয়ার অভ্যাস

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময়ে যেমন, খাবার তৈরি করার আগে, খাবার খাওয়া বা শিশুকে খাওয়ানোর আগে, নিজে শৌচ করার পর এবং শিশুকে শৌচ করানোর পর সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ ইন্টারভেনশন প্রকল্পের জন্য আমরা একটি বেজলাইন পরীক্ষা করেছি। দৈবচয়নের ভিত্তিতে চিহ্নিত বাংলাদেশের ৩৪টি জেলার ১০০টি এলাকা থেকে (কমিউনিটি) বাছাইকৃত খানার শতকরা কতভাগ মানুষ হাত ধোয় মাঠকর্মীরা তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার দু'মাস পর তারা ওইসব খানাসদস্যদের হাত ধোয়ার অভ্যাসের ওপর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী খানাসদস্যগণকে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পর্যবেক্ষণকৃত ২০,৫৪৬ বারের মধ্যে ১১,৮০০ (৫৫%) বার হাত ধুতে দেখা যায়, তারমধ্যে মাত্র ৩৫০ বার (১.৭%) তারা সাবান বা ছাই ব্যবহার করে। বাংলাদেশে হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানোর কার্যক্রমে শুধুমাত্র পানি দিয়ে হাত ধোয়ার পরিবর্তে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া উচিত।

সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানোর জন্য কয়েকশ বা কয়েক হাজার বাড়িতে ছোট ছোট যেসব গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে যে, ওইসব বাড়িতে ডায়রিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ ক্রমাগত কমে গেছে (১,২)।

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

তবে ব্যাপকভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানোর কাজটি একটি কষ্টসাধ্য কাজ। ইউনিসেফের সহায়তায় এবং বৃটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিএফআইডি)-এর আর্থিক সাহায্যে বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর 'পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত শিক্ষা এবং পানি সরবরাহ (সেবা-বি)' নামক একটি ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এযাবতকালে হাত ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং পানি উন্নয়ন-সংক্রান্ত যেসব কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এটি সম্ভবত সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। বাংলাদেশের তিন কোটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ-কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ-কর্মসূচির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময়ে যেমন, খাবার তৈরি করার আগে, খাবার খাওয়া বা শিশুকে খাওয়ানোর আগে, নিজে শৌচ করার পর এবং শিশুকে শৌচ করানোর পর সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশে গবেষণলব্ধ কিছু উপাত্তে দেখা যায় যে, ছাই দিয়ে হাত ধুলে হাতে পায়খানার জীবাণুর সংখ্যা/ঘনত্ব কমে যায় (৩)।

এ-কর্মসূচির স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য আইসিডিডিআর,বি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। হাত ধোয়ার অভ্যাসের ওপর পরিচালিত আমাদের বেজলাইন গবেষণার ফলাফলের একটি সারসংক্ষেপ আমরা এখানে তুলে ধরেছি। আমরা সেবা-বি ইন্টারভেনশন কর্মসূচির আওতায় ৫০টি গ্রাম থেকে যত মানুষকে নমুনা হিসেবে নিয়েছি, ইন্টারভেনশনের বাইরে ঠিক তত মানুষকে আমরা পার্শ্ববর্তী ৫০টি গ্রাম থেকে নিয়েছি। এরপর হাত ধোয়ার ফলাফল নির্ণয়ের জন্য উভয় শ্রেণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছি (চিত্র ১)। মাঠকর্মীরা দৈবচয়নকৃত গ্রামের কেন্দ্র থেকে শুরু করে যেসব খানাতে ৫ বছরের কম-বয়সী শিশু আছে সেসব খানা চিহ্নিত করেন। এরপর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মাঠকর্মীরা ১,০০০টি নমুনা খানাতে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ৫ ঘণ্টা ধরে হাত ধোয়ার অভ্যাস-সম্পর্কিত ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হাত ধোয়ার ঘটনাগুলো মাঠকর্মীরা যথাযথভাবে নথিভুক্ত করে রাখেন।

চিত্র ১: বাংলাদেশের মানচিত্রে ইন্টারভেনশন ও কন্ট্রোল এলাকা-চিহ্নিত সেবা-বি প্রকল্প এলাকা

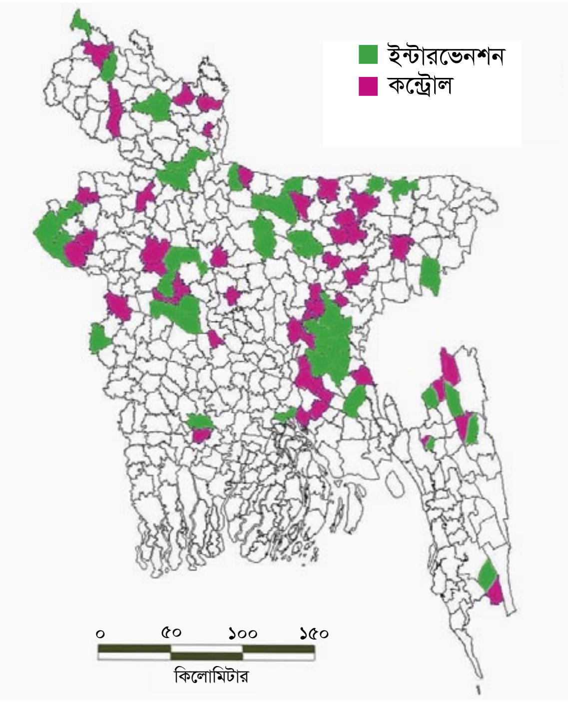

পর্যবেক্ষণের দু'মাস পরে মাঠকর্মীরা

হাত ধোয়ার অভ্যাস-সংক্রান্ত প্রশ্নমালাসহ অন্যান্য প্রশ্নের সাহায্যে ওই ১,০০০ খানা এবং নিকটবর্তী আরো ৭০০টি খানায় একটি সাক্ষাৎকার বিষয়ক সমীক্ষা চালান। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার একটি ব্যাপক চিত্র তুলে ধরার জন্য আমরা ইন্টারভেনশন এবং কন্ট্রোল এলাকার ফলাফল যৌথভাবে তুলে ধরেছি।

হাত ধোয়ার অভ্যাস-সম্পর্কিত বাস্তবসম্মত তথ্য আমরা বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করেছি। "কখন কখন আপনি সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোন?" – মাঠকর্মীদের এমন খোলা প্রশ্নের উত্তরে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের যতজন তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয় বলে জানায়, তাদের থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে জিজ্ঞেস করার পর যতজন ওই সময়গুলোতে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয় বলে জানায় তাদের আনুপাতিক হার ভিন্ন ছিলো (চিত্র ২)। তবে, অংশগ্রহণকারীদেরকে পর্যবেক্ষণের সময় যতবার হাত ধুতে দেখা গেছে সেই তুলনায় তারা বেশিবার সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধুয়ে থাকে বলে জানায়।

চিত্র ২: সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত (এক অথবা উভয় হাত) ধুয়েছে

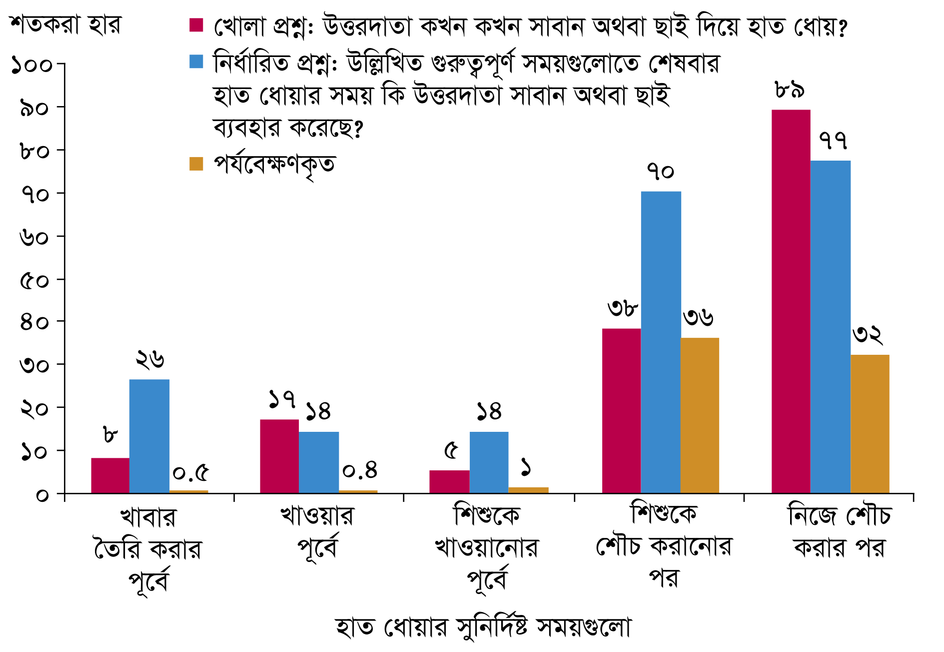

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, অংশগ্রহণকারীদের প্রায় অর্ধেক মানুষ তাদের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হাত ধোয়ার চেষ্টা করেছে, তবে সাধারণত শুধুমাত্র পানি দিয়ে (চিত্র ৩)। বস্তুত, সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত ধুতে খুব কমই দেখা গেছে। খাবার আগে থেকে শুরু করে শিশুকে শৌচ করানো পর্যন্ত সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত ধোয়ার হার ১% থেকে ২৩%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।

চিত্র ৩: যারা পানি ও সাবান দিয়ে উভয় হাত ধুয়েছে তাদের সাথে যারা শুধুমাত্র পানি দিয়ে হাত ধুয়েছে তাদের তুলনামূলক চিত্র

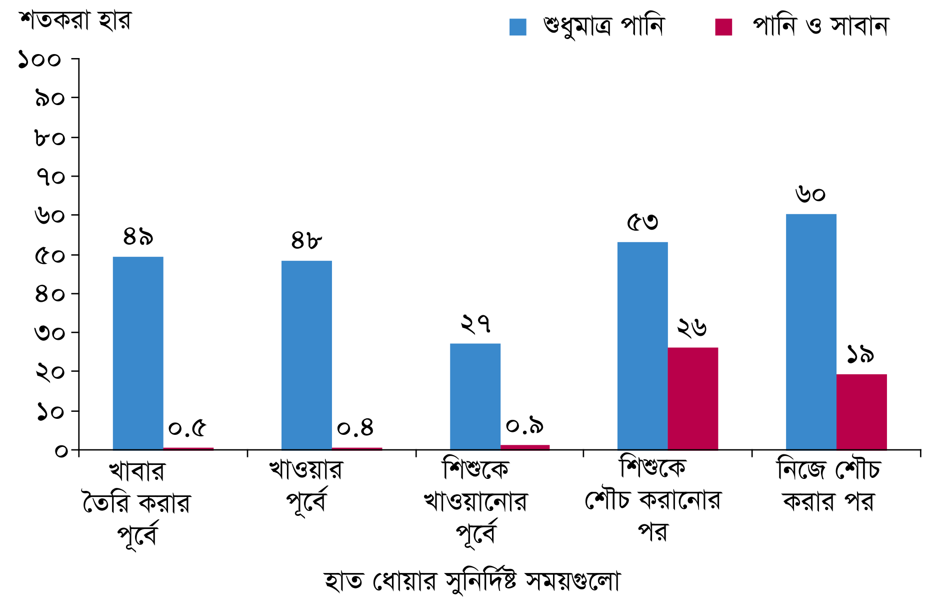

চিত্র ৪: পর্যবেক্ষণের সময় সাবান বা ছাই দিয়ে যতবার হাত ধুতে দেখা গেছে তার সাথে যতবার তারা হাত ধোয় বলে জানায় তার তুলনামূলক চিত্র

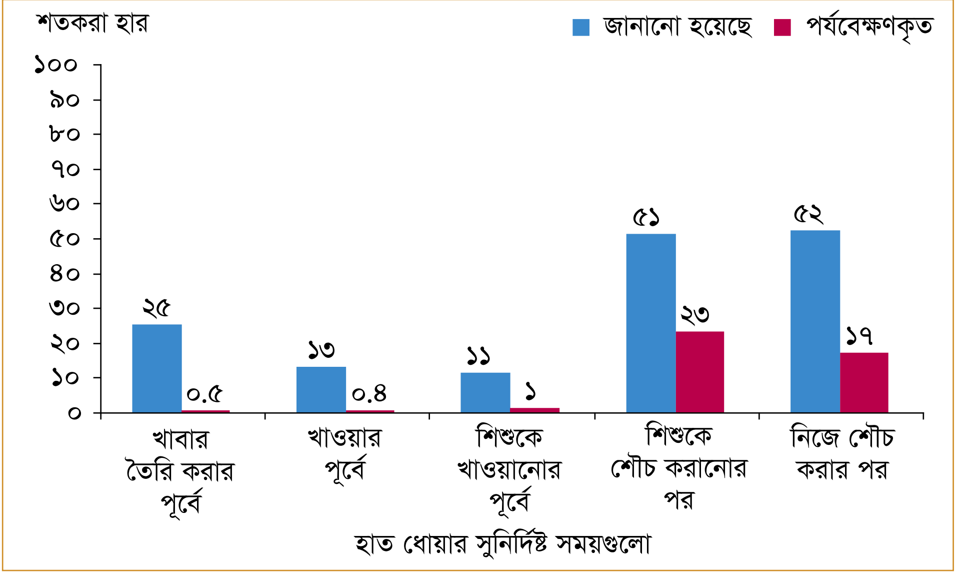

অংশগ্রহণকারী খানা সদস্যগণকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পর্যবেক্ষণকৃত ২০,৫৪৬ বারের মধ্যে মোটের উপর ১১,৮০০ (৫৫%) বার হাত ধুতে দেখা যায় এবং তারমধ্যে শুধুমাত্র ৩৫০ বার (১.৭%) সাবান অথবা ছাই ব্যবহার করে (চিত্র ৪)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ গবেষণার উত্তরদাতা মা/শিশু পরিচর্যাকারীদেরকে অথবা তাদের শিশুকে (৩-৫ বছর বয়সের) পায়খানা করার পর তারা সাধারণত যেভাবে হাত ধোয় সেভাবে হাত ধুয়ে দেখাতে বলেন। শতকরা ৫৫ জন মা এবং ৩-৫ বছর-বয়সী ৪২% শিশু সাবান অথবা ছাই দিয়ে তাদের দু'হাত ধুয়ে দেখায়। যারা সাবান ব্যবহার করে তাদের অর্ধেক-সংখ্যক ১৪ সেকেন্ড বা তার থেকে কম সময়ে সাবান দিয়ে দু'হাত কচলিয়ে ধুয়ে ফেলে (মিডিয়ান ১৪ সেকেন্ড) এবং বাকী অর্ধেক ১৪ সেকেন্ড বা তার থেকে বেশি সময় ধরে সাবান দিয়ে কচলিয়ে হাত ধোয়।

প্রতিবেদক: সংক্রামক ব্যাধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি (পিআইডিভিএস), আইসিডিডিআর,বি এবং জাতিসংঙ্ঘ শিশু কল্যাণ তহবিল (ইউনিসেফ)

অর্থানুকুল্য: জাতিসংঙ্ঘ শিশু কল্যাণ তহবিল (ইউনিসেফ), ঢাকা, বাংলাদেশ

মন্তব্য

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত একটি বড় ধরনের ক্রস-সেকশনাল গবেষণায় অংশগ্রহণকারী খানাসমুহের উত্তরদাতাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে সাবান দিয়ে তাদের হাত ধোয়ার কথা জানায় এবং যখন তাদেরকে হাত ধুয়ে দেখাতে বলা হয় তখন তাদের অর্ধেকের বেশি মানুষ সাবান বা ছাই দিয়ে ভালোভাবে কচলিয়ে হাত ধুয়ে দেখায়। তবে, এই প্রশ্নমালাসমৃদ্ধ সমীক্ষার দু'মাস পূর্বে সেই একই খানাগুলোর অর্ধেকেরও বেশি সদস্যদেরকে পর্যবেক্ষণকৃত গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে সাধারণত শুধুমাত্র পানি দিয়ে হাত ধুতে দেখা গেছে।

যেসব গবেষণায় হাত ধোয়ার ফলে ডায়রিয়া রোগ কমেছে বলে জানা যায়, তার সবগুলোতেই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাসের প্রসার ঘটানো হয়েছিলো (১,২)। খুশির খবর হলো, কখন কখন সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে সে-সম্পর্কে এলাকাবাসীর ভালো ধারণা ছিলো এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে অর্ধেকের কিছু বেশি মানুষের অন্ততপক্ষে শুধু পানি দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস ছিলো। হাত ধোয়ার অভ্যাস প্রচলন কর্মসূচির পরবর্তী মূল কর্তব্য হচ্ছে, সঠিকভাবে এ-অভ্যাসের আরও ব্যপ্তি ঘটানো যাতে মানুষ সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস পুরোপুরি রপ্ত করতে পারে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী খানা সদস্যদেরকে পর্যবেক্ষণের সময় যতবার হাত ধুতে দেখা গেছে তার চেয়ে বেশি বার তারা হাত ধুয়ে থাকে বলে জানায়। বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের ইতোপূর্বেকার গবেষণাতেও লক্ষ্য করা গেছে যে, মানুষকে বাস্তবে যতবার হাত ধুতে দেখা যায় তার থেকে বেশিবার হাত ধোয়ার কথা তারা জানায় (৪,৫)। এই ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, প্রশ্ন করে হাত ধোয়া-সম্পর্কিত অভ্যাসের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা পুরো বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে না। সেবা-বি প্রকল্প কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট ওইসব উপজেলা বেছে নেওয়ার কারণ ওইসব এলাকায় এর প্রয়োজনীয়তা ছিলো সবচেয়ে বেশি। তবে উল্লিখিত অংশগ্রহণকারীদেরকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ হিসেবে গণ্য করা যায় এবং আরো উল্লেখ্য যে, উভয় শ্রেণীর (ইন্টারভেনশন এবং কন্ট্রোল)

অংশগ্রহণকারীদের হাত ধোয়ার অভ্যাস ছিলো একই রকম (উপাত্ত দেখানো হয় নি), যা থেকে বোঝা যায় যে, এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মানুষের হাত ধোয়ার অভ্যাসের কোনো তারতম্য ছিলো না।

জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত আচার-আচরণ পরিবর্তন করা একটি কঠিন কাজ। তবে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিসেফ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যাস পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে এই ইন্টারভেনশন কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার আগামী সংখ্যাগুলোতে তুলে ধরবো।

তথ্যসূত্র

1. Ejemot RI, Ehiri JE, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing for preventing diarrhoea. *Cochrane database syst rev* 2008;1:CD004265.
2. Rabie T, Curtis V. Handwashing and risk of respiratory infections: a quantitative systematic review. *Trop Med Int Health* 2006;11258-67.
3. Hoque BA, Briend A. A comparison of local handwashing agents in Bangladesh. *J Trop Med hyg* 1991;94:61-4.
4. Stanton BF, Clemens JD, Aziz KM, Rahman M. Twenty-four-hour recall, knowledge-attitude-practice questionnaires, and direct observations of sanitary practices: a comparative study. *Bull World Health Organ* 1987;65:217-22.
5. Cousens S, Kanki B, Toure S, Diallo I, Curtis V. Reactivity and repeatability of hygiene behaviour: structured observations from Burkina Faso. *Soc Sci Med* 1996;43:1299-308.

বাংলাদেশে *পটকা* মাছ খেয়ে টেট্রোডোটক্সিন বিষের প্রাদুর্ভাব

পটকা মাছ খেয়ে টেট্রোডোটক্সিন বিষের প্রভাবে বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে ইতোপূর্বে কিছু মানুষ মারা গেছে। ২০০৮ সালের এপ্রিল-জুন মাসের মধ্যে নংরসিংদী, ঢাকা এবং নাটোর জেলায় *পটকা* মাছের বিষক্রিয়াজনিত তিনটি প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায়। এসব প্রাদুর্ভাবে ৮৪ জন মানুষ অসুস্থ হয় এবং এদের ১২ (১৪%) জন মারা যায়। গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে *পটকা* মাছের বিষক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক *পটকা* মাছ সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রাদুর্ভাবসমূহের জন্য দায়ী। *পটকা* মাছের বিষক্রিয়ায় মানুষ মারা যায় -- এ-খবরটি জাতীয়ভাবে প্রচার করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রদুর্ভাব মোকাবেলায় তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

টেট্রাঅডোন্টিফরমেস গোত্রভুক্ত *পটকা* মাছ ইংরেজিতে ব্লো বা *বেলুন* মাছ হিসেবে পরিচিত এবং স্থানীয়ভাবে *পটকা* বা *টেপা* মাছ (১)। বাংলাদেশে পটকা মাছের ১৩টি প্রজাতি আছে যাদের দু'টি মিঠা পানিতে এবং বাকীগুলো সমুদ্রে বাস করে (২)। *পটকা* মাছের বিষ 'টেট্রোডোটক্সিন' (টিটিএক্স) একটি শক্তিশালী স্নায়বিক বিষাক্ত পদার্থ যা মানুষের উত্তেজক (এক্সাইট্যাবল) সেল মেমব্রেনের সোডিয়াম চ্যানেল বন্ধ করে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম (১,৩)। সেল মেমব্রেনের প্রোটিন সিকুয়েন্সের মধ্যে মিউটেশনের কারণে মাছটি নিজে বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয় না (৪)। মাছের

বিষাক্ত পদার্থটি তার যকৃত, ডিম্বাশয়, অন্ত্র এবং চামড়ার মধ্যে খুব বেশি ঘনীভূত থাকে, তবে শরীরের পেশীসমূহ সাধারণত বিষমুক্ত থাকে (১,৫)। সব পটকা মাছই বিষাক্ত নয়। কিছু আছে যেগুলো হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বিষাক্ত, যদিও প্রত্যেক প্রজাতির *পটকা* মাছের বিষের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন বাংলাদেশে নেই (৬)। মাছের বিষের পরিমাণ নির্ভর করে এর লিংগ, ভৌগলিক অবস্থান এবং মওসুমের ওপর। প্রজননের অব্যবহিত পূর্বে এবং প্রজননকালীন সময়ে এতে অপেক্ষাকৃত বেশি বিষ থাকে (৫,৬) এবং পুরুষ থেকে স্ত্রীজাতীয় মাছ বেশি বিষাক্ত, কারণ অণ্ডকোষ থেকে ডিম্বাশয় বেশি বিষাক্ত থাকে।

এশিয়া মহাদেশের সমুদ্র-উপকুলবর্তী এলাকাসমূহের মানুষ যেসব বিষক্রিয়ার সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সেগুলোর মধ্যে *পটকা* মাছের বিষক্রিয়া একটি (১)। এ-বিষের ফলে মানুষের জিহ্বা এবং ঠোঁটের স্বাদ নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, মাথা ঘোরে ও বমি হয় এবং পরবর্তীতে শরীর অসাড় হয়ে আসে, সারা শরীর ঝিনঝিন করে, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায় এবং মাংসপেশী অসাড় হয়ে পড়ে। ডায়াফ্রাম অসাড় হয়ে যাওয়ার ফলে শ্বাসতন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তবে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার বেশি যে জীবিত থাকে সে সাধারণত বেঁচে যায় (৭)।

চিত্র ১: বাংলাদেশের মানচিত্রে নরসিংদি, ঢাকা, নাটোর এবং কক্সবাজার জেলার অবস্থান

২০০৮ সালের এপ্রিল-জুন মাসের মধ্যে নংরসিংদী, ঢাকা এবং নাটোর জেলায় *পটকা* মাছের বিষক্রিয়াজনিত তিনটি প্রাদুর্ভাবের খবর আসে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এ (চিত্র ১)। আইইডিসিআর ও আইসিডিডিআর,বির একটি যৌথ অনুসন্ধানকারী দল সবগুলো প্রাদুর্ভাব তদন্ত করে। সেই সাথে দলটি কক্সবাজার পরিদর্শণ করে সেখানকার জেলেদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক *পটকা* মাছ ধরা ও সেগুলো বাজারে বিক্রি করা-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। *পটকা* মাছের বিষাক্ততা এবং সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকায় এ-মাছের বিষক্রিয়াজনিত লক্ষণের ওপর জেলেদের জ্ঞান সম্পর্কেও তারা জানার চেষ্টা করে।

দলটি গ্রামবাসী এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকায়

যারা *পটকা* মাছ খেয়েছিলো তাদেরকে সনাক্ত করে। তাদের কাছে মাছের বিষক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান, এই মাছ খাওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা, মাছ কেনার স্থান, মাছ খাওয়া ও অসুস্থতা শুরু হওয়ার মধ্যেকার সময়ের লক্ষণসমূহ এবং সেগুলোর স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে দলটি রোগের অসুস্থতার ইতিহাস সংগ্রহ করে।

২০০৮ সালের ৯ এপ্রিল নরসিংদীতে ৪০ ব্যক্তি *পটকা* মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের ৫ (১৩%) জন মারা যায়। অনুসন্ধানকারী দলটি ১৬ জন রোগীর সন্ধান পায় যারা ৬টি পরিবারের সদস্য এবং একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলো। স্থানীয় লোকজন জানায় যে, তারা সর্বশেষ ২০-৩০ বছর আগে তাদের গ্রামে এ-মাছ দেখেছিলো এবং তখন তারা এটিকে বিষাক্ত মাছ হিসেবে জানতো। তবে স্থানীয় বাজারে পুনরায় যখন এটি পাওয়া গেল তখন তারা ভাবলো যে, এতে এখন হয়তো আর কোনো বিষ নেই। প্রাদুর্ভাবকবলিত গ্রামবাসীরা জানায় যে, প্রাদুর্ভাবের দিন এই মাছ পার্শ্ববর্তী কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলা থেকে এসেছিলো, এবং কুলিয়ারচরে এই মাছ কক্সবাজার থেকে এসেছিলো বলে জানা যায়। কুলিয়ারচর উপজেলায়ও একজন মাছ বিক্রেতা ও তার পরিবারের দু'জন সদস্য এই মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মাছ বিক্রেতা ও তার মেয়ে মারা যায়।

৩ জুন ২০০৮ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় যে, ঢাকা শহরের তেজকুনি পাড়ার কিছু মানুষ *পটকা* মাছের বিষে আক্রান্ত হয় -- ১১ জন এই মাছ খায়, তাদের ৯ জন বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং ৩ জন (২৭%) মারা যায়। আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে এই মাছ দিয়েছিলো তাদের এক প্রতিবেশি আত্মীয় যে ছিলো উক্ত এলাকার একজন পরিচ্ছন্ন কর্মী। তারা জানায় যে, ময়লার বাক্সে ফেলে দেওয়া ৫টি মাছ ওই পরিচ্ছন্ন কর্মী বাড়িতে নিয়ে যায়, এবং ওইগুলো যে *পটকা* মাছ ছিলো তা সে তাদেরকে জানিয়ে দেয়, তবে এর বিষক্রিয়া সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলো না।

৮ জুন ২০০৮, খুব সকালে নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার দমদমা গ্রামের বাজারে ৬০-৭০ কেজি *পটকা* মাছ বিক্রি হয়। *পটকা* মাছ খেয়েছিলো এমন ৬৫ জন গ্রামবাসীর অবস্থা জানার জন্য আমরা অনুসন্ধান চালাই এবং জানতে পারি যে, *পটকা* মাছ খাওয়ার পর তাদের ৩৫ জন অসুস্থ হয়েছিলো, যাদের ৪ জন পরে মারা যায়। এই প্রাদুর্ভাবের সময় ৪৪ জন (৭০%) উত্তরদাতা জানতো যে, এটি ছিলো *পটকা* মাছ। যদিও তাদের বেশির ভাগ মানুষই (৯৪%) এই প্রজাতির মিঠা পানির মাছ খায় যা তাদের নদী ও বিলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, বিশেষ করে বর্ষাকালের পর, এবং এই মাছ খেয়ে তারা কখনো অসুস্থ হয় নি। তারা জানায় যে, এই প্রজাতির মিঠা পানির মাছ খুবই সুস্বাদু। সুতরাং, তারা ভেবেছিলো, অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এই *পটকা* মাছ হয়তো আরো বেশি স্বাদের হবে এবং বিশ্বাস করে নি যে, তা বিষাক্ত হতে পারে।

তিনটি প্রাদুর্ভাবের সব রোগীই মাছ খাওয়ার পর খুব শীঘ্রই শরীরের সর্বত্রই একটি ঝিনঝিনভাব, চুলকানি, জিহ্বা ভারী ও অসাড় হয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা, মাথা ব্যাথা, হাঁটতে অসমর্থতা এবং সাধারণ দুর্বলতাসম্বলিত রোগের লক্ষণের কথা জানিয়েছে (চিত্র ২)।

কক্সবাজারের সামুদ্রিক জেলেদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তারা যখন বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার চেষ্টা করে তখন প্রায়ই তারা কিছু পটকা মাছ তাদের জালে পেয়ে থাকে। এই মাছের মূল্য তাদের

কাছে খুব কম, কারণ এই মাছ বিষাক্ত বলে স্থানীয় লোকজন জানে এবং সেজন্য সাধারণত তারা এ-মাছ খায় না। পটকা মাছ ধরার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে নভেম্বর মাস। স্থানীয় জেলেরা ৪-৫ প্রকারের সামুদ্রিক *পটকা* মাছ চেনে এবং এগুলোর প্রতিটির ওজন ২০০ গ্রাম থেকে ২/৩ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে বলে তারা জানায়।

চিত্র ২: মাছ খাওয়ার পর থেকে যতক্ষণের মধ্যে রোগীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে

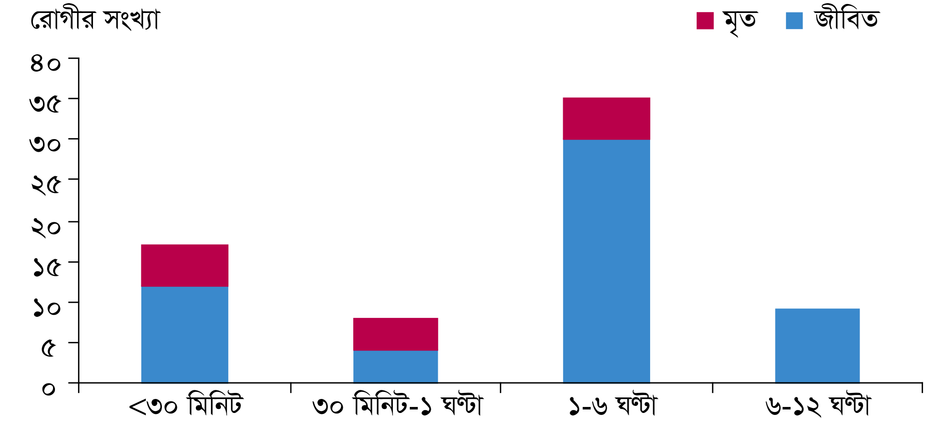

জেলেরা জানায় যে, তারা সাধারণত এই মাছ বিক্রি করে না। তবে, তারা যদি ২০-৩০ কেজির মতো মাছ ধরতে পারে, তাহলে সেগুলো ১৫-২০ টাকা কেজি দরে তারা স্থানীয় জেলেদের কাছে বিক্রি করে থাকে। স্থানীয় জেলেরা সেগুলো দিয়ে শুটকি তৈরি করে। শুটকি তৈরির সময় তারা মাছের পিত্তথলি, যকৃত, নাড়ীভুড়ি এবং ডিম ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র চামড়া এবং মাথা রাখে। শুটকি প্রস্তুতকারকেরা বিশ্বাস করে যে, মাছের পিত্তথলি এবং ডিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিষ থাকে এবং সেগুলো আস্ত ফেলে দিলে মাছ খাদ্য-উপযোগী হয়। কাটা-মাছ রৌদ্রে শুকিয়ে চট্টগ্রাম, রাংগামাটি এবং বান্দরবানের শুটকি বাজারে বিক্রি করা হয়, এবং হাঁস-মুরগীর খাবার তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় উত্তরদাতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, *পটকা*-শুটকির মধ্যে কোনো বিষ থাকে না। স্থানীয় জেলেরা জানায় যে, কোনো কোনো জেলে মাঝে-মধ্যে তাজা *পটকা* মাছ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রির জন্য পাঠায়, এই আশায় যে, যেসব স্থানের লোকজন এ-মাছের বিষাক্ততা সম্পর্কে জানে না সেসব স্থানে তারা এ-মাছ সহজে বিক্রি করতে পারবে।

প্রতিবেদন: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংক্রামক ব্যাধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

মন্তব্য

যদিও *পটকা* মাছের বিষক্রিয়াজনিত ঘটনা ইতোপূর্বে বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেছে, তবে একই বছরে তিনবার সংঘটিত প্রাদুর্ভাব থেকে বোঝা যায় যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ

স্বাস্থ্য সমস্যা (১,২)। প্রাদুর্ভাবের সাথে জড়িত সব ব্যক্তিই *পটকা* মাছের সাথে পরিচিত। তারা হয় মিঠাপানির পটকা খেয়ে অভ্যস্ত, অথবা এই মাছ তারা আগেও দেখেছে। তবে মিঠাপানির *পটকা* খাওয়ার মধুর অভিজ্ঞতা এই মাছের বিষক্রিয়া সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার একটি কারণ। বছরের প্রথম তিন মাসে বিশ্বব্যাপী খাদ্যসামগ্রীর দামের সূচক ৫৭.৫% পর্যন্ত উঠেছে যা জেলেদেরকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি করে *পটকা* মাছ বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ করেও থাকতে পারে এবং এর দাম কম হওয়াতেও মানুষ এটি কিনে থাকতে পারে (৮)।

নরসিংদীতে প্রথম প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় টেলিভিশন এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে *পটকা* মাছের উৎস, এর বিষক্রিয়া এবং সমুদ্র ও নদীর *পটকা* মাছের আকার-আকৃতির ওপর ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। এতে মানুষকে যে কোনো *পটকা* মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। তবে, যারা পরবর্তীতে প্রাদুর্ভাবের কবলে পড়ে তারা এসব খবর জানতো না বলে জানিয়েছে। ভবিষ্যৎ যোগাযোগের কৌশলপত্র গ্রামের মানুষের জন্য আরো সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তৈরি করা উচিত। গ্রামের মধ্যে সাইকেল, রিক্সা অথবা ভ্যান গাড়িতে করে মাইকে, গণসংগীতের মাধ্যমে, চায়ের স্টলে অথবা স্কুল এবং মসজিদের সীমানা দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর মাধ্যমে, এবং স্থানীয় হাটের দিনে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা যেতে পারে। এছাড়া, মিঠাপানির *পটকা* এবং *পটকা*-শুটকির বিষক্রিয়া-সম্পর্কিত তথ্য বিভ্রান্তিকর হবে, যদি এগুলো নিয়মিতভাবে খাওয়া সত্ত্বেও কোনো রকমের দুর্ঘটনা না ঘটে। *পটকা* মাছ খাওয়া থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার খবর আরো পরিচ্ছন্নভাবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট প্রজাতির *পটকা* মাছের বিষক্রিয়া সম্পর্কে জানা উচিত এবং এজন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন।

চিকিৎসকগণ যদি এমন কোনো রোগী দেখেন যাদের শরীরের সর্বত্রই একটি ঝিনঝিন ভাব মনে হয় হয়, মাথা ঘোরে এবং শরীরের কোনো অংশ বা হাত-পা অবশ হয়ে যায়, তাহলে তারা *পটকা* মাছ খেয়েছে কি না তা অনুসন্ধান করে দেখা উচিত (৯)। টেট্রোডোটক্সিনের বিরুদ্ধে যেহেতু নির্ধারিত কোনো অ্যান্টিডোট নেই, সেহেতু অ্যাট্রোপাইনের সাথে নিওস্টিগমাইনের সঠিক মাত্রার প্রয়োগ এবং সাপোর্টিভ চিকিৎসার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা যেতে পারে (৫)। চিকিৎসকগণ কোনো রোগীকে পটকা মাছের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত বলে সন্দেহ করলে তাড়াতাড়ি তা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।

তথ্যসূত্র

1. Ahasan HA, Mamun AA, Karim SR, Bakar MA, Gazi EA, Bala CS. Paralytic Complications of Puffer Fish (Tetrodotoxin) Poisoning. *Singapore Med J* 2004;45:73-4.
2. Diener M, Christian B, Ahmed MS, Luckas B. Determination of tetrodotoxin and its analogs in the puffer fish Takifugu oblongus from Bangladesh by hydrophilic interaction chromatography and mass-spectrometric detection. *Anal Bioanal Chem* 2007;389:1997-2002.
3. Do HK, Hamasaki K, Ohwada K, Simidu U, Noguchi T, Shida Y *et al*. Presence of Tetrodotoxin and Tetrodotoxin-Producing Bacteria in Freshwater Sediments. *Appl Environ Microbiol* 1993;59:3934-7.

4. Wikipedia., Tetraodontidae. 2008. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pufferfish, accessed on 11 September 2008)
5. Chowdhury FR, Ahasan HAN, Rashid AKM, Mamun AA, Khaliduzzaman SM. Tetrodotoxin poisoning: a clinical analysis, role of neostigmine and short-term outcome of 53 cases. *Singapore Med J* 2007;48:830-3.
6. Lee MJ, Jeong DY, Kim WS, Kim HD, Kim CH, Park WW *et al*. A Tetrodotoxin-Producing Vibrio Strain, LM-1, from the Puffer Fish Fugu vermicularis radiatus. *Appl Environ Microbiol* 2000;66:1698-701.
7. Isbister GK, Son J, Wang F, Maclean CJ, Lin CS, Ujma J *et al*. Puffer fish poisoning: a potentially life-threatening condition. *Med J Aust* 2002;177:650-3.
8. Asian Development Bank. Economics and Research Department. Food prices and inflation in developing Asia: is poverty reduction coming to an end? Manila : Economics and Research Department. Asian Development Bank, 2008. 23 p. (http://www.adb.org/Documetns/reports/food-prices-inflation/food-price-inflation.pdf, accessed on 11 September 2008)
9. Tetrodotoxin. Food and Drug Administration: Foodborne pathogenic microorganisms and natural toxins handbook. Rockville: U.S. Food and Drug Administration. (http://www.cfsan.fda.gov/~mow/chap39.html, accessed on 11 September 2008.)

বাংলাদেশে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর খামার-কর্মীদের ওপর নজরদারি

২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩৯টি জেলায় হাঁস-মুরগীর খামারে সংঘটিত এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রাদুর্ভাবের ওপর ভিত্তি করে ওইসব খামারে কর্মরত কর্মীরা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো কোনো রোগে আক্রান্ত ছিলো কি না তা নির্ণয় করার জন্য রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেসব ব্যক্তি এইচ৫ প্রাদুর্ভাবকবলিত হাঁস-মুরগীর খামারে কাজ করেছে এবং যাদেরকে ওইসব খামারেরর হাঁস-মুরগী নিধনের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিলো, তাদেরকে এ-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চৌদ্দ দিনব্যাপী পর্যবেক্ষণের সময় তাদেরকে প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টি-ভাইরাল ট্যাবলেট দিয়ে প্রথম ৭ দিন চিকিৎসা করা হয়, এবং তাদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার লক্ষণ আছে কি না তা জানার জন্য প্রতিদিন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ও তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণের পুরো সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করে ২,৭৮৬ জন খামারকর্মীর মধ্যে মাত্র ৬ জন খামারকর্মীর কাছ থেকে জানা যায় যে, তারা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় ভুগেছে, কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক অসুস্থতা তাদের কারো ছিলো না। এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, হাঁস-মুরগীর খামারকর্মীদেরকে নিয়মানুযায়ী প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টি-ভাইরাল ট্যাবলেট দেওয়া এবং তারা এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত কি না তা পর্যবেক্ষণ করা-সংক্রান্ত সরকারি কার্যক্রম সার্থক হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে হাঁস-মুরগীর খামারে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয় বলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০০৭ সালের মার্চ থেকে ২০০৮ সালের মে পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৭টিতে হাঁস-মুরগীর খামারে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হওয়ারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ৩৯টি জেলায় ১৫২টি প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয় বলে জানা যায়। বিশ্বব্যাপী এইচ৫এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত অধিকাংশ মানুষই আক্রান্ত হয় তাদের ঘরের ভিতরের বা পাশের কোনো হাঁস-মুরগীর খামার থেকে (১-৩)। বাংলাদেশের ৮০% মানুষই যেহেতু গ্রামে বাস করে এবং তাদের প্রায় ৮০% মানুষই হাঁস-মুরগী লালন-পালন করে (৪,৫), সেহেতু এটি একটি জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত সমস্যা। গ্রামাঞ্চলের কিছু কাজকর্ম মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১ সংক্রমণের সাথে জড়িত, যেমন– হাঁস-মুরগী জবাই করা, চামড়া ছোলা এবং অসুস্থ মুরগী রান্নার জন্য প্রস্তুত করা (৬,৭)।

২০০৭ সালের মার্চ মাসে দেশব্যাপী শুরু হওয়া এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ সরকারের গবাদিপশু সেবা বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস) যেসব খামার থেকে হাঁস-মুরগী মারা যাওয়ার খবর পেয়েছে সেসব খামার থেকে মৃত হাঁস-মুরগীর নমুনা সংগ্রহ করেছে (৮)। নমুনাগুলোর মধ্য থেকে এইচ৫ সংক্রমণ সনাক্ত করার জন্য সেগুলো কেন্দ্রীয় জাতীয় গবাদিপশু গবেষণাগার, বাংলাদেশ গবাদিপশু গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই)-এ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। কোনো খামারে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর স্থানীয় গবাদিপশু কর্তৃপক্ষ সংক্রামিত খামার এবং এর এক কিলোমিটারের মধ্যে বাণিজ্যিক বা বাড়ির আংগিনায় অবস্থিত সব খামারের সব হাঁস-মুরগী মেরে ফেলে। ২০০৮ সালের মে মাস থেকে হাঁস-মুরগী নিধনের কৌশল পাল্টানো হয় এবং নতুন কৌশল অনুযায়ী প্রাদুর্ভাবকবলিত খামার যদি কোনো বাণিজ্যিক খামার হয়, তাহলে শুধুমাত্র সেই খামারের হাঁস-মুরগী নিধন করা হবে এবং যদি বাড়ির আংগিনার কোনো খামার আক্রান্ত হয়, তাহলে সেটিসহ তার ৫০০ মিটারের মধ্যে যত খামার আছে সেগুলোর হাঁস-মুরগী নিধন করা হবে।

আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর খামারের কর্মীরা এবং হাঁস-মুরগী নিধনের কাজে জড়িত শ্রমিকেরা আক্রান্ত খামারের খুব ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে থাকার দরুন এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে ছিলো। তাই এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর খামারের ঝুঁকিপূর্ণ সব কর্মী এবং হাঁস-মুরগী নিধনের কাজে জড়িত শ্রমিকদেরকে প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো কোনো রোগে কেউ আক্রান্ত থাকলে তাকে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আই-ইডিসিআর) ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে তাদেরকে একটি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এইচ৫ প্রাদুর্ভাবকবলিত হাঁস-মুরগীর খামারে কাজ করেছে এবং যাদেরকে ওইসব খামারেরর হাঁস-মুরগী নিধনের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিলো, তাদেরকে এ-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব খামারকর্মীদের ওপর পর্যবেক্ষণের প্রতিদিনের প্রতিবেদন নিশ্চিত করার জন্য আইইডিসিআর একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং তদারকি-কৌশল তৈরি করে। মেডিকেল অফিসার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা হাঁস-মুরগী নিধনের কাজে জড়িত থাকা শ্রমিকদেরকে তালিকাভুক্ত করেন এবং তাদের জনমিতিসংক্রান্ত তথ্যাবলি রেকর্ড করেন। এছাড়া, তাদেরকে অনুরোধ করা হয়, তারা যেন পরবর্তী ১৪ দিনের প্রত্যেক

দিন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা অফিসে হাজির হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের লক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং রোগীদেরকে বিনামূল্যে প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টিভাইরাল ট্যাবলেট (প্রতিদিন একবার করে ৭৫ গ্রাম অসেলটামিভির ৭ দিন পর্যন্ত) দিয়ে চিকিৎসা করার জন্য প্রত্যেকবার পরিদর্শনের সময় একটি কাঠামোগত প্রশ্নাবলির সাহায্যে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় (৯)। হঠাৎ জ্বর, কাশি এবং গলা ব্যাথাজনিত অসুস্থতাকে আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছি। মেডিকেল অফিসার এবং/অথবা স্বাস্থ্য সহকারীরা একটি কাঠামোগত ফরমে উপজেলা পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলি লিখে রাখতেন এবং পরে তা জেলা সিভিল সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, যিনি প্রতিদিন তা আইইডিসিআর-এ পাঠাতেন। আক্রান্ত কোনো জেলা থেকে কোনো দিন তথ্য আসতে দেরি হলে আইইডিসিআর থেকে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওইদিনের তথ্য পাঠানো নিশ্চিত করতে বলা হতো।

২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের এইচ৫-আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর খামারসমূহ থেকে মোট ৩,৯৬০ জন খামারকর্মীকে সনাক্ত করেছি। তাদের মধ্যে ৩,৬৪১ (৯২%) জনকে অন্তত একদিন আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং প্রত্যেকে অন্তত এক ডোজ করে অ্যান্টিভাইরাল প্রোফাইল্যাক্সিস নিয়েছে। ৩,২৩৭ জন (৮২%) নির্ধারিত ৭ দিনের কোর্স এবং ২,৭৮৬ জন (৭০%) পুরো ১৪ দিনের কোর্স সম্পন্ন করেছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮ পর্যবেক্ষণকালীন সময়ের প্রত্যেক মাসেই পর্যবেক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে এবং ফলে এপ্রিল-মে পর্যন্ত ১০০% পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নিয়মিত তদারকিরই এ-সার্থকতা নিশ্চিত করেছে (চিত্র ১)।

জানুয়ারি ২০০৮-এ মাত্র একজন রোগী পাওয়া যায় যে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত ছিলো, এবং ফেব্রুয়ারিতে আরো পাঁচজনকে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই ছয়জনের চলাফেরা তাদের নিজ নিজ বাড়ির মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করার জন্য আইইডিসিআর স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। স্থানীয় চিকিৎসকদের দ্বারা তাদেরকে একটি বর্ধিত মাত্রার অ্যান্টিভাইরাল ডোজ (প্রতিবার ৭৫ এমজি অসেলটামিভির প্রতিদিন দু'বার করে ৫ দিন) দিয়ে চিকিৎসা এবং প্রতিদিন তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত এই ছয়জনের রোগের লক্ষণ ধরা পড়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে তাদের লক্ষণগুলো মিলিয়ে যায়, তবে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জা নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে কোনো পরীক্ষা করা হয় নি।

প্রতিবেদন: অ্যাভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ফলোআপ মনিটরিং কমিটি, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থানুকুল্য: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্তব্য

শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক রোগসমূহ দ্রুত নির্ণয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হাঁস-মুরগীর খামারকর্মীদের ওপর উন্নত পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০০৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম প্রাদুর্ভাবের পর থেকে এ-পর্যন্ত এসব হাঁস-মুরগীর খামারকর্মীদের ওপর পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত কোনো উপাত্ত সংরক্ষিত হয় নি। আইইডিসিআর-এর প্রশিক্ষণ এবং তদারকি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা

চিত্র ১: বাংলাদেশে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর খামারসমূহের তালিকাভুক্ত কর্মীদের পর্যবেক্ষণ (জানুয়ারি-মে ২০০৮)

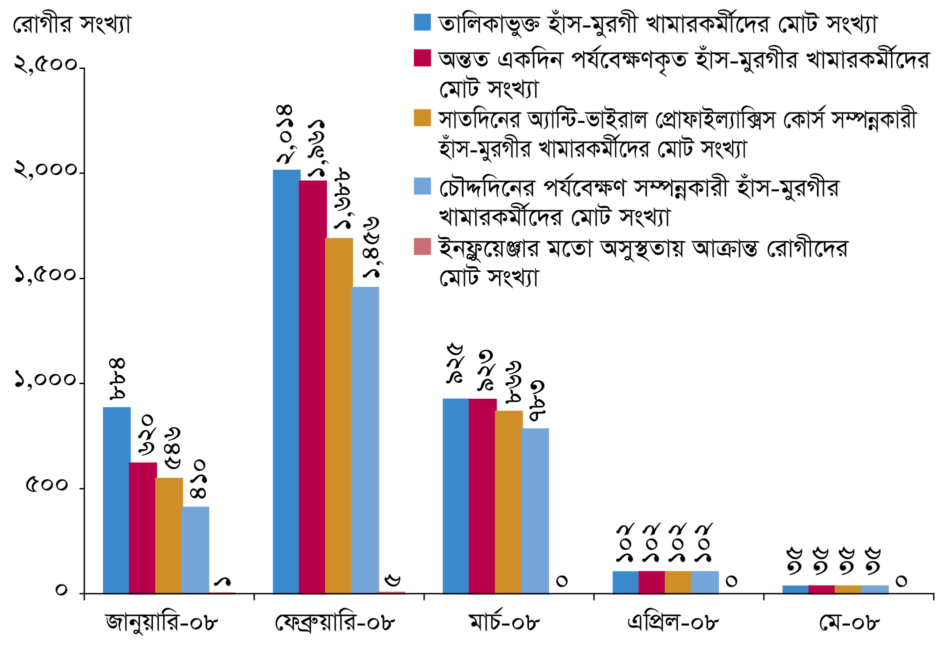

২০০৮ সালের জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত তালিকাভূক্ত হাঁস-মুরগীর খামারকর্মীদের পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংরক্ষণ করি। এ-গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, ঝুঁকিপূর্ণ হাঁস-মুরগীর খামারকর্মীদের মধ্য থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী-নির্ণয় এবং তাদেরকে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে আলোচ্য কৌশল যে সার্থক হয়েছে সে ব্যাপারে সরকার আস্থাশীল হতে পারে।

পুরো ১৪ দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে ২,৭৮৬ জন খামারকর্মীর মধ্যে মাত্র ৬ জনকে পাওয়া যায় যারা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় ভুগেছে। তবে, কারোর অসুস্থতাই মারাত্মক ছিলো না এবং সব রোগীই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। অন্যকোনো রোগ-জীবাণুর ফলে হয়তো তাদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের লক্ষণ দেখা গেছে। তবে, হংকং-এ হাঁস-মুরগীর খামারকর্মীদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় তাদের মধ্যে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জার হালকা অথবা অস্পষ্ট সংক্রমণ দেখা গেছে (১০)। পর্যবেক্ষণের সময় অসেলটামিভির-এর প্রোফাইল্যাকটিক এবং চিকিৎসা ডোজ হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত ওই ছয়জনের রোগের লক্ষণ কমিয়ে দিতে পারে, যার সাথে দক্ষিণ-এশিয়ায় পরিচালিত অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের মিল পাওয়া যায় যেখানে অসেলটামিভির দিয়ে প্রারম্ভিক চিকিৎসার ফলে এইচ৫এন১-এ আক্রান্ত রোগীদের বেঁচে যাওয়ার হার বাড়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে (১১)।

বাংলাদেশে এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জায় সংক্রামিত হাঁস-মুরগীর খামারের ওপর যদিও বর্তমানে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম চালু আছে, তবে আরো অনেক হাঁস-মুরগীর খামারের, বিশেষ করে বাড়ির আংগিনায় গঠিত খামারের প্রাদুর্ভাবের খবর না পাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। এমনকি অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের খামারও অনেক বেশি লোকসানের ভয়ে হয়তো অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগীর খবর জানায়নি, কারণ তাদের বিনিয়োগের তুলনায় হাঁস-মুরগী নিধনের বিপক্ষে সরকারি সাহায্য বা ক্ষতিপূরণ ছিলো খুবই নগণ্য। সুতরাং অনেক হাঁস-মুরগী খামারকর্মী আলোচ্য সার্ভিলেন্স থেকে বাদ পড়েছে যারা এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে। তদুপরি, দুর-দুরান্তের গ্রাম থেকে আগত অনেক দিনমজুর স্বল্পকালীন হাঁস-মুরগী নিধনের কাজে নিয়োজিত ছিলো বলে এসব শ্রমিকের সবাইকে পুরো ১৪ দিনব্যাপী পর্যবেক্ষণ করা সব সময় সম্ভব হয় নি। স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কারিগরি দক্ষতার ভিন্নতার দরুন আমাদের কাঠামোগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আওতায় হালকা ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগী নাও আসতে পারে, তবে যেসব হাঁস-মুরগীর খামারকর্মীর ওপর পুরো পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তাদের মধ্যেকার কেউ মারাত্মক অসুস্থ থাকলে তাদের বাদ পড়ার সম্ভাবনা ছিলো না।

চিকিৎসকেরা শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক রোগীর সন্ধান পেলে তাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত যে তারা গত একমাসের মধ্যে অসুস্থ অথবা মৃত হাঁস-মুরগীর সংস্পর্শে এসেছিলো কি না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, তাদের পরিবারে বা প্রতিবেশিদের মধ্যে সম্প্রতি একই ধরনের অসুস্থতায় কেউ আক্রান্ত হয়েছিলো কি না। একই স্থানে কিছু লোকের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ দেখা দিলে চিকিৎসকদের উচিত অনতিবিলম্বে তা আইইডিসিআর-কে জানানো।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে বর্তমানে অসেলটামিভির-এর পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং এগুলো এইচ৫ ইনফ্লুয়েঞ্জার ঝুঁকির মধ্যে অবস্থানকারীদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। শ্বাসতন্ত্রজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগীর সংস্পর্শে এসে কেউ অসুস্থ হলে বেসরকারি চিকিৎসকদের উচিত তাদেরকে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে পাঠানো।

তথ্যসূত্র

1. Dinh PN, Long HT, Tien NT, Hien NT, Mai le TQ, Phong le H, *et al*. Risk factors for human infection with avian influenza A H5N1, Vietnam, 2004. *Emerg Infect Dis* 2006;12:1841-7.
2. Sedyaningsih ER, Isfandari S, Setiawaty V, Rifati L, Harun S, Purba W, *et al*. Epidemiology of cases of H5N1 virus infection in Indonesia, July 2005-June 2006. *J Infect Dis* 2007;196:522-7.
3. Oner AF, Bay A, Arslan S, Akdeniz H, Sahin HA, Cesur Y, *et al*. Avian influenza A (H5N1) infection in eastern Turkey in 2006. *N Engl J Med* 2006;355:2179-85.
4. Fattah K A. Poultry as a tool in poverty eradication and promotion of gender equality. *In*: Proceedings of the Workshop on Women in Agriculture and Modern Communication Technology, March 30 – April 3, 1998, Denmark. Tune Landboskole: Danish Agricultural and Rural Development Advisers' Forum, 1998. (http://www.ardaf.org/NR/rdonlyres/84479639-0C22-4173-9FC0-91A834581687/0/19992fattah.pdf, accessed on 4 May 2008).

5. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Life with chickens in Bangladesh: backyard poultry farming. (http://www.icddrb.org/news/index.jsp? idDetails=158, accessed on 28 August 2008).
6. Areechokchai D, Jiraphongsa C, Laosiritaworn Y, Hanshaoworakul W, O'Reilly M; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Investigation of avian influenza (H5N1) outbreak in humans--Thailand, 2004. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2006;55(Suppl 1):3-6.
7. Abdel-Ghafar AN, Chotpitayasunondh T, Gao Z, Hayden FG, Nguyen DH, de Jong MD, *et al*. (Writing Committee of the Second World Health Organization Consultation on Clinical Aspects of Human Infection with Avian Influenza A (H5N1) Virus). Update on avian influenza A (H5N1) virus infection in humans. *N Engl J Med* 2008;358:261-73
8. Bangladesh. Ministry of Fisheries and Livestock. Bird flue-related events. Dhaka: Ministry of Fisheries and Livestock, Government of Bangladesh. (http://www.mofl.gov.bd /event.pdf, accessed on 27 July 2008).
9. Beigel JH, Farrar J, Han AM, Hayden FG, Hyer R, de Jong MD, *et al*. (Writing Committee of the World Health Organization (WHO) Consultation on Human Influenza A/H5.) Avian influenza A (H5N1) infection in humans. *N Engl J Med* 2005;353:1374-85.
10. Bridges C B, Lim W, Hu-Primmer J, Sims L, Fukuda K, Mak K H *et al*. Risk of influenza A (H5N1) infection among poultry workers, Hong Kong, 1997–1998. *J Infect Dis* 2002;185:1005–10.
11. Chotpitayasunondh T, Ungchusak K, Hanshaoworakul W, Chunsuthiwat S, Sawanpanyalert P, Kijphati R, *et al*. Human disease from influenza A (H5N1), Thailand, 2004. *Emerg Infect Dis* 2005;11: 201-9.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: সেপ্টেম্বর ২০০৭-আগস্ট ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=২৮৬)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা=৫৪৬)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২২.২	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৮৪.৯	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৪৯.৭	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৮.৮	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৮৮.১	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৩৫.২
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৬.৪
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০০৭-আগস্ট ২০০৮

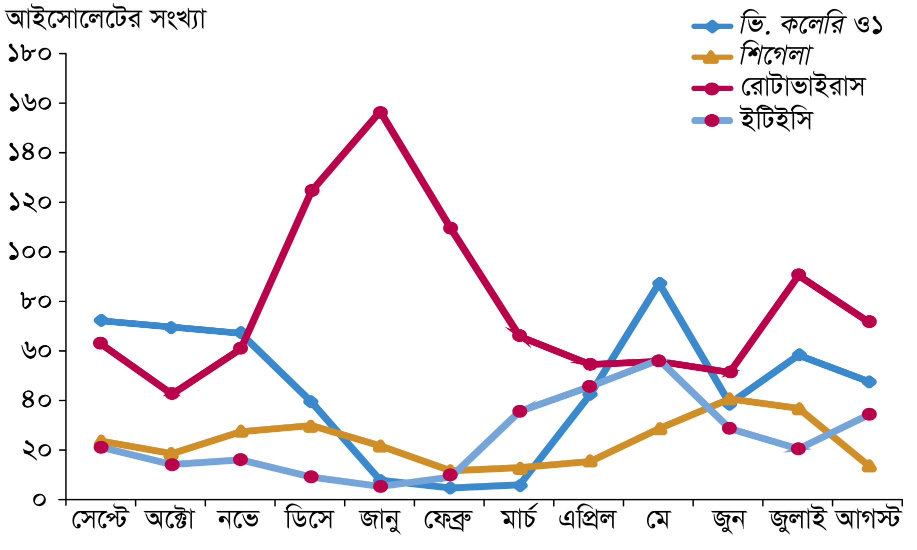

ওষুধের বিরুদ্ধে ৮২ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণু প্রতিরোধের ধরন: অক্টোবর ২০০৭-মে ২০০৮

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট (সংখ্যা=৮২)
	প্রাথমিক (সংখ্যা=৬৭)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১৫)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	৮ (১১.৯)	৫ (৩৩.৩)	১৩ (১৫.৯)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৪ (৬.০)	২ (১৩.৩)	৬ (৭.৩)
ইথামবিউটাল	০ (০.০)	১ (৬.৭)	১ (১.২)
রিফামপিসিন	১ (১.৫)	২ (১৩.৩)	৩ (৩.৭)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	১ (১.৫)	২ (১৩.৩)	৩ (৩.৭)
অন্যান্য ওষুধ	৯ (১৩.৪)	৫ (৩৩.৩)	১৪ (১৭.১)

( ) শতকরা হার *একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২৪	২৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৪	১১ (৪৬.০)	০ (০.০)	১৩ (৫৪.০)
ক্লোরামফেনিকল	২৪	২৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিআক্সোন	২৪	২৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৩	২৩ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	২৪	১ (৪.০)	২ (৮.০)	২১ (৮৮.০)
অক্সাসিলিন	২৪	২২ (৯২.০)	০ (০.০)	২ (৮.০)

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ট হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা, শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর; এবং আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর (ঢাকা) এবং মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৭৫	৩৪ (৪৫.০)	১ (১.০)	৪০ (৫৪.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৭৫	৪১ (৫৫.০)	১ (১.০)	৩৩ (৪৪.০)
ক্লোরামফেনিকল	৭৫	৩৯ (৫২.০)	০ (০.০)	৩৬ (৪৮.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৭৫	৭৫ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭৫	৪২ (৫৬.০)	৩০ (৪০.০)	৩ (৪.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৭৫	৪ (৫.০)	১ (১.০)	৭০ (৯৪.০)

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতা; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ট হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা, শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর; এবং আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর (ঢাকা) এবং মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সার্ভিলেন্স এলাকা।

মাসভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার: মে ২০০৭-জুলাই ২০০৮

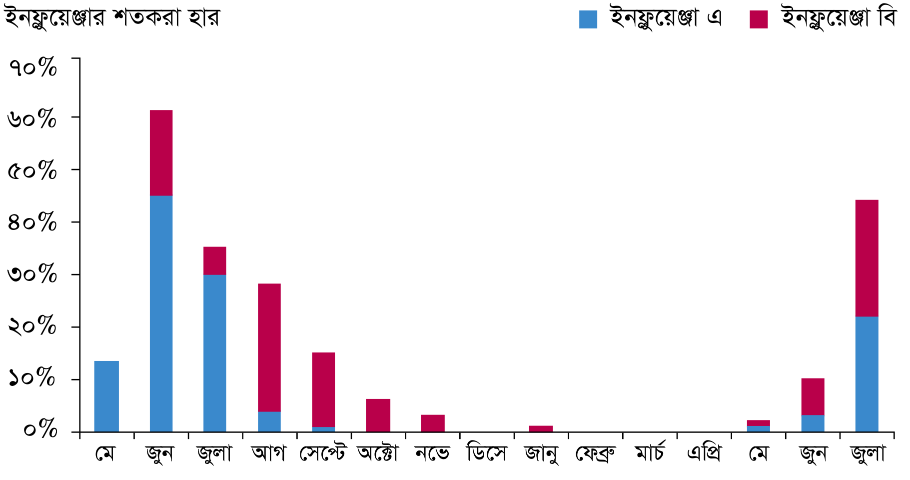

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিং), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

কক্সবাজারে ধৃত সামুদ্রিক পটকা মাছ (সৌজন্যে: শাহানা পারভীন)

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
এমিলি গারলি
ডরোথি সাউদার্ন
এডোয়ার্ডো আজিজ-বামগার্টনার

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
অমল কৃষ্ণ হালদার
নুসরাত হোমায়রা
মুহাম্মদ আজিজ রহমান

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যাবস্থাপনা এবং অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb